বিলু ও তার মৌমাছি

বিলু আর তার বাবা যে গ্রামটাতে থাকে তার নাম পলাশপুর, গ্রামটা চন্দ্রা নদীর তীরে। বিলুর মা মারা যাবার আগে তারা থাকত ঢাকা শহরে। বিলুর বাবা চাকরি করতেন একটা বিদেশি ফার্মে। তাদের বাসা ছিল সাততলার উপরে একটা চকচকে ফ্ল্যাটে। বিলু যেত একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। তার মা গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা যাবার পর সবকিছু কেমন যেন ওলটপালট হয়ে গেল। তার বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়ে অনেকদিন ঘরে বসে রইলেন। তারপর একদিন বিলুকে বললেন, এখানে আমার কিছুই ভালো লাগছে না রে!

বিলু তার বাবাকে খুব ভালবাসে, বলল, কী করবে বাবা?

চল অন্য কোথাও যাই।

কোথায় যাবে বাবা?

নিরিবিলি একটা গ্রামে।

বিলু বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, চল বাবা।

বাবা মাথা চুলকে বললেন, ভালো স্কুল থাকবে না কিন্তু!

না থাকল। বিলু দাঁত বের করে হেসে বলল, স্কুল আমার এমনিতেই ভালো লাগে না।

বাবার পরিচিত যত আত্মীয়স্বজন রয়েছেন সবাই বাবাকে খুব বোঝাল, বাবা কারো কথা শুনলেন না। একদিন চন্দ্রা নদীর তীরে পলাশপুর গ্রামে উঠে এলেন। গ্রামের লোকেরা অবশ্যি বিলুকে আর বাবাকে দেখে খুব খুশি হল। বাবা জুওলজিতে পি.এইচ.ডি করেছেন বলে তার নামের আগে একটা ডক্টর আছে। গ্রামের সবাই তাই ধরে নিল বাবা বুঝি ডাক্তার। তারা বাবার কাছে নানারকম অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার জন্য আসতে লাগল। বাবা প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে তিনি রোগী দেখার ডাক্তার না। কিন্তু তাতে খুব লাভ হল না। শেষে বাবা হাল ছেড়ে দিয়ে চিকিৎসা করতে শুরু করে দিলেন। বেশিরভাগই সহজ চিকিৎসা, জ্বর ডায়রিয়া আর খোশপাঁচড়া। যদি বাড়াবাড়ি কিছু হয়

বাবা শহরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতেন। অল্পদিনে এই এলাকায় বাবার খুব নামডাক হয়ে গেল।

বাবা তার রোগীদের কাছ থেকে কোনো পয়সাকড়ি নিতেন না। সবাই তাই বাবাকে বুদ্ধি দিল ইটের ভাটা না হয় রাইস মিল তৈরি করতে। বাবা সেসব না করে মৌমাছির ফার্ম খুললেন। মৌমাছির ফার্ম তৈরি করা যায় গ্রামের লোকেরা জানত না। তাই অনেক দূর দূর থেকে সবাই বাবার মৌমাছির ফার্ম দেখতে আসত। বড় বড় কাচের জানালা মতোন ছিল, তার মাঝে মৌমাছি চাক তৈরি করেছে, বাইরে থেকে দেখা যেত ভেতরে হাজার হাজার মৌমাছি ছোটাছুটি করতে। মৌমাছিরা ভারি পরিশ্রমী! এতটুকু বিশ্রাম না নিয়ে দিনরাত ছোটাছুটি করছে।

বিলু প্রথম প্রথম ভাবত মৌমাছিরা বুঝি এমনিই ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করছে। বাবার সাথে সাথে মৌমাছি দেখতে দেখতে সে আবিষ্কার করল সেটা ঠিক নয়। মৌমাছিরা নিজেদের মাঝে নানারকম খবরাখবর দেয়ানেয়া করে। ব্যাপারটা কীভাবে হয় জানার পর বিলুর হঠাৎ করে মৌমাছি সম্পর্কে কৌতূহল এক শ গুণ বেড়ে যায়। মানুষের কোনো বিষয়ে একবার কৌতূহল জন্মে গেলে সে সেই ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি শিখে যায়। তাই বছরখানেকের মাঝেই বিলু হয়ে গেল মৌমাছি বিশেষজ্ঞ। বিলুর বাবাও মৌমাছি সম্পর্কে জানেন। কিন্তু দেখা গেল কিছু কিছু ব্যাপারে বিলু তার বাবার থেকেও বেশি জানে।

গ্রামে এসে বিলু বেশ কয়দিন একা একা থাকত। প্রথম প্রথম গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়েদের সাথে তার সেরকম বন্ধুত্ব হল না। সবাই গ্রাম্যসুরে কথা বলে, অনেক সময় তাদের কথা ভালো করে বুঝতেও পারত না। কিন্তু একবার তাদের সাথে পরিচয় হবার পর দেখা গেল গ্রামের ছেলেমেয়েরা বন্ধু হিসাবে একেবারে এক নম্বর। তারা ইংরেজি একেবারে জানে না, অঙ্ক আর বিজ্ঞানে যাচ্ছেতাই, কিন্তু স্কুলের বাইরের সব ব্যাপারে তাদের মতো একজন মানুষ হয় না। তারা সবাই একেবারে মাছের মতো সাঁতার কাটতে পারে, জেলেদের মতো নৌকা বাইতে পারে, বানরের মতো গাছে উঠতে পারে। তারা ছাতার শিক দিয়ে পাখি ধরার ফাঁদ তৈরি করতে পারে, পিঁপড়ার ডিম দিয়ে মাছ ধরতে পারে, তারা দাঁত দিয়ে কামড়ে আখের ছিলকে সরিয়ে কচকচ করে খেতে পারে। যারা একটু বেশি চালু ধরনের তারা বগলে হাত দিয়ে প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করতে পারে, চোখের পাতা উল্টিয়ে ভূত সাজতে পারে। সত্যি কথা বলতে কী, গ্রামের ছেলেদের একবার বন্ধু হিসেবে অভ্যাস হয়ে গেলে শহরের ছেলেদের একেবারে পানসে মনে হবে।

বিলুর সময় তখন বেশ ভালোই কাটছে। সে তার সব বন্ধুদের ইংরেজি হোমওয়ার্ক করে দেয় বলে বন্ধুরাও তাকে খুব পছন্দ করে। সারাদিন স্কুল করে বিকেলে তারা নদীর তীরে একটা মাঠে কাদা মেখে হা-ডু-ডু না হয় ফুটবল খেলে। খেলা শেষে তারা লাফিয়ে নদীতে নেমে পড়ে নদী তোলপাড় করে সাঁতার কাটে।

বিলুর দিন যখন মোটামুটি বেশ আনন্দের মাঝে কাটছে তখন একদিন তার জীবনে একটা যন্ত্রণার উদয় হল। যন্ত্রণাটির নাম রনি। সে ঢাকায় একটা স্কুলে পড়ে। এখানে তার নানার বাড়ি, গরমের ছুটিতে নানা বাড়ি বেড়াতে এসেছে। প্রথম দিন রনির সাথে তাদের দেখা হল নদীর তীরে তাদের খেলার মাঠে। হা-ডু-ডু খেলায় তারা সবাই মিলে ফারুখকে

কাদার মাঝে চেপে ধরেছে, ফারুখ ক্রমাগত হটোপুটি করে পিছলে বের হয়ে আসতে চেষ্টা করছে এবং তাই নিয়ে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। তখন হঠাৎ শুনল কে যেন বলল, হাউ ডিসগাস্টিং! তাই শুনে বিলু চমকে উঠে মাথা তুলে তাকাল এবং দেখতে পেল ধবধবে পরিষ্কার জামাজুতো পরে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে—আর এই ফাঁকে ফারুখ পিছলে বের হয়ে গেল। ছেলেটি এবারে মাটিতে থুতু ফেলে পাশে দাঁড়ানো পুতুলের মতো দেখতে তার ছোট বোনকে আবার বলল, হাউ ডিসগাস্টিং!

ছোট বোনটি কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়ল। তখন সেজেগুজে থাকা ছেলেটি ঘেন্নায় বমি এসে যাচ্ছে এ রকম ভান করে হেঁটে হেঁটে নদীর তীরের দিকে চলে গেল। বিলুর বন্ধুরা তখন খেলা থামিয়ে চোখ বড় বড় করে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল। ফারুখ দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, দেওয়ান সাহেবের নাতি। নাম রনি।

নান্টু বলল, আলিশান বড়লোক। ঢাকায় সাততলা বাড়ি।

জলিল বলল, দুইটা গাড়ি। একটা গাড়ি এয়ারঘন্টিশন।

বিলু বলল, এয়ারঘন্টিশন না এয়ারকন্ডিশন।

জলিল কেনে আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, একই কথা।

আজরফ বলল, গতবার যখন এসেছিল একটা খেলনা গাড়ি এনেছিল, সেটাকে দূর থেকে চালায়। তাজ্জব ব্যাপার।

বিলু বলল, তাজ্জবের কী আছে। রিমোট কন্ট্রোল।

তোমার আছে?

বিলু একটা নিশ্বাস ফেলল। তার একসময় সবকিছু ছিল। এখন কিছু নেই। ইচ্ছে করেই আনে নি। গ্রামের রাস্তায় রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি মনে হয় খুব জঘন্য দেখাবে।

বিলু আবার খেলা শুরু করতে চাচ্ছিল; কিন্তু দেখা গেল অন্যদের এখন আর খেলায় বেশি উৎসাহ নেই। দেওয়ান সাহেবের নাতি রনি কী করে একটা মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে দেখাতেই তাদের বেশি উৎসাহ। তারা চোখ বড় বড় করে রনির পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল আর রনি মুখে এমন ভাব করতে লাগল যেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে বা আর কিছু! বিলুর এমন মেজাজ খারাপ হল যে বলার নয়।

পরদিন স্কুলে অঙ্ক ক্লাসে হঠাৎ করে হেডমাস্টার রনিকে নিয়ে এসে তার দাড়ি নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললেন, এই হচ্ছে রনি। আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি সাহেবের নাতি। সে কখনো গ্রামের স্কুল দেখে নাই। তাই দেখতে এসেছে। শহরের স্কুলে কেমন করে পড়াশোনা হয় সে সেটাও তোমাদের বলবে। ক্লাসের সব ছেলেমেয়ের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর তাই দেখে বিলুর আবার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

রনি ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইংরেজি আর ভাঙা এক রকমের বাংলায় তার স্কুল যে কত ভালো, কত পরিষ্কার, মোটেও এই স্কুলের মতো নোংরা না, তারা যে কত রকম নতুন পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে এবং এই স্কুলে সবাই যেটা ক্লাস নাইন-টেনে শেখে তারা যে সেই সব জিনিস ক্লাস সিক্স-সেভেনেই শিখে ফেলে সেইসব জিনিস বলতে লাগল। এসব কথা শুনে বিলুর একেবারে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দেখা গেল অন্য সবাই একরকম মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে রনির কথা শুনছে।

রনির ব্যাপারটা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেল সেইদিন বিকালে। স্কুল শেষ করে বাবার সাথে মৌমাছি ফার্মে খানিকক্ষণ কাজ করে নদীতীরে খেলতে গিয়ে দেখে সেখানে কয়েকজন মানুষ গর্ত করে বাঁশ পুঁতছে। রনি পকেটে হাত দিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয় কাজের খবরদারি করছে। বিলু অবাক হয়ে কাছে এগিয়ে গেল। রনি এমন ভান করল যেন সে তাকে দেখতেই পায় নি। যে মানুষগুলো বাঁশ পুঁতছে তাদের একজনের নাম কাজেম আলি, সে বিলুকে দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, বিলু বাজান কেমুন আছেন?

বিলু বলল, ভালো। তারপর জিজ্ঞেস করল, কাজেম চাচা এখানে কী করছেন?

কিলাব হাউচ তৈরি হচ্ছে।

ক্লাব হাউজ?

জে। বাঁশ পুঁতে উঁচু ঘর তৈরি হবে। সেটারে বলে কিলাব হাউচ।

এইখানে?

জে।

বিলু গলা শক্ত করে বলল, এইখানে আমরা হা-ডু-ডু খেলি।

রনি তখন কাছে এসে কাজেম আলিকে বলল, কথা বলছ কেন? কাজ কর, কালকের মাঝে শেষ করতে হবে।

কাজেম আলি মাথা নেড়ে বলল, জে জে করছি। তারপর খন্তা দিয়ে মাটিতে গর্ত করতে শুরু করল।

বিলুর মাথায় রক্ত উঠে গেল, সে চোখ পাকিয়ে বলল, এখানে কিছু তৈরি করতে পারবে না। এইখানে আমরা খেলি।

রনি বাঁকা করে হেসে বলল, খেল? নাকি কাদায় গড়াগড়ি দেও?

বিলু বলল, আমার যা ইচ্ছা তাই করি। তোমার কী?

রনি হাত ভাঁজ করে বুকের উপর ধরে বলল, এটা আমার নানার প্রপার্টি—এখান থেকে যাও, না হলে তোমার ঘাড় ধরে বের করে দেব।

বিলু বিশ্বাস করতে পারল না যে তাকে কেউ এ রকম করে বলতে পারে। লাফিয়ে উঠে ধরে প্রায় একটা ঘুসি মেরেই বসছিল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিল।

কাজেম আলি তাড়াতাড়ি রনির কাছে এসে বলল, এইভাবে কথা বলে না ছোট সাহেব। ডাক্তার সাহেবের ছেলে—

রনি বলল, আই ডোন্ট কেয়ার। আমার নানার প্রপার্টিতে আমি যা ইচ্ছে তাই করব, আমার ইচ্ছা।

বিলু বুঝতে পারল সে যদি আর কিছুক্ষণ থাকে তাহলেই রনি ছেলেটাকে একটা ধোলাই দিয়ে দেবে। বাবা মারপিট একেবারে পছন্দ করেন না—কাজেই ব্যাপারটাতে আপাতত একটা আনন্দ হলেও পরে অনেক দুঃখ হতে পারে। তাই সে আর কোনো কথা না বলে নিজের বাসায় ফিরে এল।

বিলুর যখন কোনো কারণে মন খারাপ হয় সে তখন মৌমাছিদের নিয়ে খেলা করে, আজকেও তাই শুরু করল। কিছুক্ষণের মাঝেই সে রনির কথা ভুলে গেল, মৌমাছিদের কাজ করতে দেখার মতো আনন্দ আর কোনো কিছুতেই নেই!

পরদিন ফারুখ খবর আনল 'কিলাব হাউচ' নাকি প্রায় দাঁড়া হয়ে গেছে। ব্যাপারটা একটা মাচা ছাড়া আর কিছু নয়। দুপুরবেলা নান্টু খবর আনল 'কিলাব হাউচে' রনি আর তার ছোট বোন বসে বসে রুটি খাচ্ছে। বাড়াবাড়ি বড়লোকেরা দুপুরবেলায় রুটি খায়। ঢাকা থেকে সেই রুটি আনা হয়েছে। বিকালবেলা জলিল সবচেয়ে বড় খবর আনল, আগামীকাল শহর থেকে রনির বন্ধুরা আসছে—তারা কখনো গ্রাম দেখে নাই, তাই গ্রাম দেখতে আসছে।

শুনে বিলু একটা নিশ্বাস ফেলল। এক রনিকে দিয়েই তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে, এখন যদি এক ডজন রনির মতো চিড়িয়া এসে হাজির হয়, তাহলে তো তার এই এলাকা ছেড়েই চলে যেতে হবে।

পরদিন আজরফ এসে বলল, রনির বন্ধুরা এসে গেছে, তারা সবাই এখন বিশ্রাম নিচ্ছে।

বিলু বলল, তোরা কী করছিস?

আমরা ওদের বাসার কাছে যে জারুল গাছ আছে সেটাতে বসে আছি।

কেন?

রনির বন্ধুরা কী করে দেখতে হবে না? আজরফ আর কোনো কথা না বলে ছুটে চলে গেল।

বিলু সারাদিন তার মৌমাছিদের সাথে সময় কাটাল। সারাদিন তার বন্ধুরা তার সাথে দেখা করতে এল না, সবাই নিশ্চয়ই রনির বন্ধুদের পিছে পিছে ঘুরছে। গ্রামের ছেলেদের এই হচ্ছে সমস্যা। সবকিছুতেই তাদের উৎসাহ—তাদেরকে নিয়ে যে ঠাট্টা তামাশা করছে সেটা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই!

বিকেলবেলা বিলু হাঁটতে বের হল। যাবে না যাবে না করেও সে হেঁটে হেঁটে তাদের খেলার মাঠের কাছে হাজির হল। অনেক দূর থেকে সে অনেকগুলো ছেলের হইচই শুনতে পাচ্ছিল, দূর থেকে তাদের এক নজর দেখেই চলে আসবে ভাবছিল, কিন্তু ফারুখ তাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। কাজেই বিলু খুব গম্ভীর হয়ে পকেটে হাত দিয়ে একটু এগিয়ে যায়।

যেখানে তাদের খেলার মাঠ ছিল সেখানে চারটা বাঁশ পুঁতে তার উপর একটা বড় মাচা এবং মাচার উপর ছন দিয়ে একটা চালা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে কয়েকজন ছেলে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। কয়েকজন নিচে দাঁড়িয়ে আছে এবং সবাই মিলে মনে হয় খুব ফুর্তি করছে। ছেলেগুলোর জামাকাপড় খুব পরিষ্কার, চেহারাছবি—স্বাস্থ্যও খুব ভালো—দেখলেই বোঝা যায় এরা বড়লোকের ছেলে। বিলু ভাবছিল সে তার বন্ধুর সাথে এক দুইটা কথা বলেই চলে আসবে। কিন্তু সেটা করা গেল না, তাকে দেখেই রনি মাচার উপর থেকে চিৎকার করে বলল, এসেছে, ওই ছেলেটা এসেছে।

রনির কথা শুনে সব কয়জন ছেলে মাথা ঘুরিয়ে বিলুর দিকে তাকাল। তার সম্পর্কে কী বলছে কে জানে, ছেলেগুলো মুখে এক ধরনের বিদ্রূপের হাসি নিয়ে বিলুর দিকে তাকিয়ে রইল।

বিলু চলেই আসত, তখন একজন ছেলে গলা উঁচিয়ে বলল, এই ছেলে তুই আর তোর বাবা নাকি পাগলা?

বিলুর মাথায় হঠাৎ মনে হল একটা ছোট বিস্ফোরণ ঘটে গেল। তার কয়েক সেকেন্ড লাগল নিজেকে শান্ত করতে। তারপর সে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটার কাছাকাছি গিয়ে বলল, তুমি কী বললে?

বিলুকে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখে ছেলেটা একটু ভয় পেয়ে পিছিয়ে তার অন্য বন্ধুদের কাছে চলে যায়। বিলু কোমরে হাত দিয়ে বলল, তুমি কী বললে?

ছেলেটা এবার গলা উঁচিয়ে বলল, তুই আর তোর বাবা হচ্ছে পাগলা।

বিলু আঙুলটা তুলে বলল, আমি ঠিক দশ মিনিট সময় দিচ্ছি, তুমি এবং তোমার সব বন্ধুরা এই এলাকা থেকে বিদায় হবে। জীবনের মতো বিদায় হবে।

ছেলেগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ঢ্যাঙ্গা একজন বুক চিতিয়ে বিদ্রূপ করে বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ। ঠিক দশ মিনিট। দশ মিনিট পরে যদি তোমাদের একজনও এখানে থাক তোমাদের জান আমি শেষ করব।

রনি এবারে গলা উঁচিয়ে বলল, ধর ব্যাটাকে। গিভ হিম এ থ্রেশিং।

বিলু চোখের পলক না ফেলে রনির দিকে তাকাল এবং প্রায় আট-দশজন ছেলের একজনও রনির কথামতো বিলুকে ধরে মার লাগাবার সাহস পেল না। বিলু ঘুরে দুই পা পিছিয়ে আসে, তারপর দাঁড়িয়ে গিয়ে আবার ছেলেদের দিকে তাকাল, তারপর বলল, মনে থাকে যেন ঠিক দশ মিনিট। তার এক সেকেন্ড বেশি না। আমি দশ মিনিট পরে আবার আসব।

বিলু লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে আসতে থাকে। হেঁটে আসতে আসতে শুনল ছেলেগুলো চিৎকার করে তাকে গালিগালাজ করতে করতে হাসাহাসি করছে।

বিলুর সাথে সাথে তার সব বন্ধুরাও চলে আসছিল, বিলু তাদের থামাল। বলল, তোরা আসবি না। তোরা এখানে দাঁড়া। আমি আসছি।

কী করবে তুমি?

দেখবি এক্ষুনি। তোরা থাকিস।

বিলুর বাবা মৌমাছির খাঁচাগুলো সাবধানে পরিষ্কার করছিলেন, বিলুকে ফিরে আসতে দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন, কী হল, এখন ফিরে এলি যে!

এসেছি বাবা। একটু কাজ আছে।

কাজ আছে?

হ্যাঁ বাবা আমার মৌমাছিগুলো দরকার।

কী করবি?

এক জায়গায় পাঠাব। সরে যাও বাবা। আমার সময় নেই একটুও।

বিলুর বাবা একটু হেসে সরে গেলেন।

বিলু মৌমাছির খাঁচার উপর থেকে কাচের জানালা সরিয়ে একটু জায়গা করে নিল। মৌমাছিগুলোকে একটা খবর দিতে হবে।

মৌমাছিদের নিজেদের ভেতরে খবর দেয়ানেয়ার নানারকম নিয়ম রয়েছে। একটা মৌমাছি যখন অন্য একটা মৌমাছিকে দূরে কোথাও যেতে বলতে চায় তখন সেটা ইংরেজি আট বা বাংলা চারের মতো একটা পথ ধরে নাচতে থাকে। কোন দিকে যেতে হবে সেটা

নির্ভর করে এই ইংরেজি আট বা বাংলা চারের পথটুকু কী রকম তার উপর। পথটা যদি শুইয়ে রাখা চারের মতো হয় তার মানে সোজাসুজি সূর্যের দিকে যেতে হবে। পথটা এর থেকে যত বাঁকা হবে তার মানে সূর্যের দিকের সাথে ততটুকু বাঁকা হয়ে যেতে হবে। মৌমাছি নেচে নেচে মাঝামাঝি অংশে যত সময় নিয়ে পার হয় তত বেশি দূরত্বে যেতে হয়। মৌমাছির এই তথ্যটুকু বিলু প্রথমে বই পড়ে শিখেছিল, তারপর নিজের চোখে বহুবার দেখেছে। মৌমাছিগুলো কোথায় যাবে সেই তাদের নাচ দেখেই বুঝে ফেলে।

মাস দুয়েক আগে সে প্রথম একটা মজার জিনিস করেছে। একটা মৌমাছিকে ধরে চারের মতো পথ ধরে ঘুরিয়ে এনেছে। তাই দেখে অন্য মৌমাছিরা ভেবেছে বুঝি তাদের এখন দূরে কোথাও যেতে হবে! একটু পর সত্যি সত্যি মৌমাছিগুলো বিলুর নির্দেশমতো উড়ে যেতে শুরু করেছে, বিলু ঠিক যেরকম যে দিকে যেতে বলেছে সেদিকে! ব্যাপারটা সে ধীরে ধীরে খুব ভালো করে রপ্ত করেছে। ঠিক যেখানে সে মৌমাছিকে পাঠাতে চায় সে পাঠাতে পারে। একটাকে পাঠাতে পারে, একশটাকে পারে, আবার কয়েক হাজারকেও পাঠাতে পারে। মৌমাছিকে দেখে দেখে সে আরো নানারকম জিনিস আবিষ্কার করেছে। কখনো কখনো তাদেরকে রাগিয়ে দেয়া যায়—অন্য কেউ এসে তাদের মধু খেয়ে ফেলছে এই রকম একটা তথ্য দেয়া যায়। মৌমাছিরা তখন ভীষণ রেগেমেগে ছুটতে থাকে, যাকেই পায় তাকেই হুল ফুটিয়ে দেয়! বিলু আজ তাই করবে। তাদের বলবে মহাবিপদ আসছে, এক্ষুনি ছুটে গিয়ে আক্রমণ কর। কোথায় আক্রমণ করতে হবে সেটাও বলে দেবে, তাদের খেলার মাঠে যে মাচা তৈরি করা হয়েছে সেখানে!

বিলু খুব সাবধানে দুটি কাঠি দিয়ে একটা মৌমাছিকে চেপে ধরল, সেটা পাখা ঝাপটাতে থাকে। যখন মৌমাছিটা একটু নিস্তেজ হয়ে যায় তখন সে সেটাকে বাংলা চারের মতো পথে ঘোরাতে থাকে। কিছুক্ষণের মাঝেই অন্য মৌমাছি এসে ভিড় করে এবং কোথায় কেন যেতে হবে বুঝে নেয়। সেটার দেখাদেখি তখন অন্য মৌমাছিগুলোও নাচতে শুরু করে এবং তাদের ঘিরে অন্য মৌমাছিও এসে ভিড় করে। কিছুক্ষণেই সব মৌমাছির মাঝে খবর পৌঁছে যাবে যে তাদের এখন আক্রমণ করতে ছুটে যেতে হবে, দল বেঁধে ছুটে যাবে মৌমাছি!

বিলু সাবধানে মৌমাছির কাচের জানালাটা বন্ধ করে দেয়। তারপর খেলার মাঠের দিকে হাঁটতে থাকে। সে পাজি ছেলেগুলোকে দশ মিনিট সময় দিয়েছিল। দশ মিনিট পার হওয়ার আগেই মাঠে পৌঁছানো দরকার।

খেলার মাঠে মাচার উপরে ছেলেগুলো সবাই তখনো লাফঝাঁপ দিচ্ছে, বিলু যে সত্যিই দশ মিনিট পর ফিরে আসবে সেটা তাদের কেউ বিশ্বাস করে নি। বিলুকে ফিরে আসতে দেখে তখন সবাই টিটকারি মারতে থাকে। শুধু তাই না, একজন একটা ঢিলও ছুড়ে মারে। বিলু নিজেকে বাঁচিয়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার আর কিছুই করার দরকার নেই। সে শান্ত গলায় বলল, আমি তোমাদের দশ মিনিট সময় দিয়েছিলাম এখান থেকে পালিয়ে যেতে। দেখতেই পাচ্ছি তোমরা পালাও নি। এখন আমি দশ পর্যন্ত গুনব, এর মাঝে যদি না যাও—

ছেলেগুলোর একজন খারাপ একটা গালি দিয়ে আরেকটা ঢিল ছুড়ল বিলুর দিকে এবং বিলু ঠিক সময়মতো সরে গেল বলে ঢিলটা তার গায়ে লাগল না। সে শান্ত গলায় গুনতে শুরু করে, এক–দুই–তিন—পাঁচ পর্যন্ত গোনার আগেই প্রথম মৌমাছিটি আকাশ থেকে

নেমে আসে, সেটা একবার ঘুরে সোজাসুজি ঢ্যাঙ্গা ছেলেটার গলায় হুল ফুটিয়ে দিল। ছেলেটা বিকট একটা চিৎকার দিয়ে লাফাতে থাকে এবং কিছু বোঝার আগেই হঠাৎ আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি নেমে আসে। ছেলেগুলো চিৎকার করে মাচার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে। মৌমাছিগুলো সোজাসুজি এসে হুল ফোটাতে থাকে। বিকট চিৎকার করে ছেলেগুলো ইতস্তত ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, সেই অবস্থায় কয়েকবার গড়াগড়ি খেয়ে কোনোমতে উঠে দাঁড়ায় তারপর আবার চিৎকার করে ছুটতে থাকে, শরীরের ইতস্তত জায়গায় খামচাখামচি করতে থাকে। কয়েকজন লাফিয়ে নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানে কাদার মাঝে গড়াগড়ি খেয়ে উঠে দাঁড়ায় তারপর আতংকে এবং যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে—সেই অবস্থায় তারা প্রাণপণে ছুটতে থাকে এবং চোখের পলকে সব কয়জন তাদের প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

ছেলেগুলো বিকালের ট্রেনেই শহরে ফিরে গেল। স্টেশনে যাবার পথে জারুল গাছে বিলু পা ঝুলিয়ে বসেছিল। ছেলেগুলো তাকে দেখে ভয়ে একেবারে আঁতকে উঠল। মৌমাছির কামড়ে তাদের নাকমুখ ফুলে একেবারে ভয়াবহ অবস্থা। কাউকে আর চেনা যায় না। রনি তার বাবাকে বলল, বাবা ওই যে ছেলেটা আমাদের দিকে মৌমাছি লেলিয়ে দিয়েছে।

রনির বাবা রনির কান ধরে একটা শক্ত চড় দিয়ে বললেন, আবার মিথ্যা কথা? মৌমাছির চাকে ঢিল মেরেছিস না কী, এখন অন্য মানুষকে দোষ? মৌমাছি কি মানুষ যে তাকে কেউ লেলিয়ে দিতে পারে?